কৃষ্ণের দ্বিবিধ দামবন্ধন লীলা

ড. মধুসূদন কৃষ্ণ দাস

(১). পটভূমি:

প্রবন্ধের শিরোনাম দেখে অনেকেই হয়তো চমকে উঠবেন। এ আবার কি? দামবন্ধন লীলাতো ভগবান একবারই আস্বাদন করেছেন। যশোদা মাতাকে বাৎসল্য রস নিবিড়ভাবে আস্বাদন করানোর জন্য একসময় পরমেশ্বর ভগবান তাঁর বাল্যকালে মায়ের রজ্জুবন্ধন স্বীকার করেছিলেন। একেইতো সবাই ভগবানের দামবন্ধনলীলা হিসেবে জানে। তার পরেও আবার অন্য কোন দামবন্ধন লীলা কৃষ্ণের আছে কি? হ্যা, আছে। কিশোর বয়সে একবার শ্রীরাধার মান ভাঙ্গানোর জন্য কৃষ্ণ তাঁর নীবির বন্ধন স্বীকার করেছিলেন। পার্থক্য হলো যশোদা তাঁর চুল বাঁধার দড়ি দিয়ে প্রথমে কৃষ্ণকে বাঁধার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাতে প্রথমে তিনি ব্যর্থ হন। আর রাধারাণী তাঁর কটিবন্ধ - অর্থাৎ কোমরের (পেটিকোটের দড়ি যাকে নীবি ও বলা হয়) দড়ি দ্বারা একবারের প্রচেষ্টায়ই কৃষ্ণকে তাঁর খাটের সাথে বেঁধে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন। এজন্য উভয় ক্ষেত্রেই কৃষ্ণ দামোদর নাম প্রাপ্ত হন। তবে বাঁধার পাত্রী এবং উপকরণ ছিল ভিন্ন। এজন্য কৃষ্ণকে রাধা-দামোদরের পাশাপাশি নীবি-দামোদরও বলা হয়।

(২). যশোদা কর্তৃক পলায়নরত কৃষ্ণকে ধরা:

ব্রজগোপীরা প্রায়শঃ যশোদার কাছে এসে পুত্রের ক্ষীর-ননী চুরি করার পাশাপাশি নানা ধরণের দৌরাত্মের কথা বলতেন। তাই যশোদা ভাবলেন যদি নিজেই কৃষ্ণের জন্য ক্ষীর ও ননী তৈরী করে তাঁকে খেতে দিই তবে সে তৃপ্তি সহকারে পেট ভরে খাবে। তাহলেই আর অন্যের বাড়ী গিয়ে চুরি করে খাবার ইচ্ছে হবে না। এভাবে চিন্তা করে যশোদা তখন থেকে নিজেই কৃষ্ণের জন্য ক্ষীর ও ননী তৈরী করবেন বলে ঠিক করলেন। কিন্তু গৃহদাসীরা উপস্থিত থাকতে তা করা সম্ভব ছিল না। কারণ তারাও অত্যন্ত যত্ন সহকারে কৃষ্ণের জন্য ক্ষীর ও ননী তৈরী করতো। তাই যশোদা সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন।

একটা সুযোগ ঘটে গেল। সেই সময় প্রতিবছর গোবর্ধন পর্বতে মহাসমারোহে ইন্দ্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান হতো। অনুষ্ঠানের আগের দিন যশোদা দাস-দাসীদেরকে ঐ উৎসবের বিভিন্ন কাজ করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। আর এই সুযোগে পরদিন যশোদা ভোরে উঠে নিজেই কৃষ্ণের জন্য দধি মন্থন করতে আরম্ভ করলেন।

যশোদা নিজের হাতে কৃষ্ণের জন্য দধি মন্থন করছেন। আর মনে মনে কৃষ্ণের বাল্য লীলা চিন্তা এবং মুখে কৃষ্ণ-গান করছেন। একসময় কৃষ্ণ ঘুম থেকে উঠে নিজেই দধি মন্থনরত মায়ের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং দধি মন্থনের দন্ড চেপে ধরে মাকে দধি মন্থন থেকে বিরত থাকতে বললেন। উদ্দেশ্য তাকে এখন কোলে নিতে হবে।

পুত্রের আগ্রহ দেখে যশোদা তাঁকে সাদরে কোলে নিয়ে স্তন্যপান করাতে লাগলেন। এতে পুত্র এবং মা - উভয়ই আনন্দ সাগরে ভাসলেন। সেই সময় হঠাৎ যশোদা লক্ষ্য করলেন, চুলার উপর দুধ উদ্বেলিত হচ্ছে। তাই হঠাৎ তিনি কৃষ্ণকে কোল থেকে নামিয়ে রেখে দুধ রক্ষা করার জন্য চলে যান। কৃষ্ণতো যশোদার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। সেই কৃষ্ণকে তিনি সামান্য একটু দুধ রক্ষার জন্য ছেড়ে চলে গেলেন। যশোদার কাছে কি কৃষ্ণের চেয়েও সামান্য দুধ রক্ষা করাই বড় হলো? কৃষ্ণকে ক্ষুধার্ত এবং অতৃপ্ত রেখে চলে যাওয়া কি যশোদার ঠিক হয়েছে? শ্রীমদ্ ভাগবতের ভাষ্যকারগণ বলেছেন, ঐ দুধ খেয়ে কৃষ্ণ আরও হৃষ্টপুষ্ট হবে - কৃষ্ণের এরূপ সেবার জন্যই যশোদা তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

এদিকে হঠাৎ কোল থেকে নামিয়ে দেওয়ায় কৃষ্ণ প্রথমে খুব রেগে গেলেন। কারণ তখনও তাঁর স্তন্যপানের পিপাসা মেটেনি। তাই রাগে অধর দংশন করে কাঁদতে কাঁদতে একটি নোড়া দিয়ে দধিভান্ড ভেঙ্গে দিলেন এবং অন্য জায়গায় গিয়ে সদ্যতোলা মাখন / ননী খেতে লাগলেন।

চুলা থেকে দুধ নামিয়ে যশোদা এসে দেখলেন - দধিভান্ড ভঙ্গ, সর্বত্র দধি ছড়িয়ে পড়েছে, মাখনের পাত্র শুন্য এবং কৃষ্ণ পালিয়েছে। পরে দেখলেন অধোমুখ উদুখলের উপর বসে কৃষ্ণ শিকা থেকে নবনীত / মাখন নিয়ে বানরদের খাওয়াচ্ছে। আবার চুরি করছে বলে সভয়ে এদিক-ওদিকও তাকাচ্ছে।

যশোদা ভাবলেন - কৃষ্ণ দিন দিন অশান্ত হয়ে উঠেছে। তাই এখনই ওকে শাসন করা দরকার। এসব ভেবে যশোদা একটি লাঠি নিয়ে আস্তে আস্তে কৃষ্ণের পেছনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। যশোদাকে আসতে দেখতে বানররা সব পালিয়ে গেল। ওদের পালাতে দেখে কৃষ্ণ পেছন ফিরে লাঠি হাতে মাকে আসতে দেখলেন। তখন তিনি সেখান থেকে দৌড় দিলেন। কৃষ্ণ পালাচ্ছেন। আর মা যশোদা তাঁর পিছু পিছু লাঠি নিয়ে দৌড়াতে লাগলেন।

কৃষ্ণ মায়ের ভয়ে পালাচ্ছেন - আর যশোদা তাঁকে ধরবার জন্য পেছনে পেছনে ধাওয়া করছেন। আর মাঝে মাঝেই শাসাচ্ছেন - আজ তোর দুষ্টুমির উচিত শাস্তি দেব। যশোদা ঠিক করলেন কৃষ্ণকে ধরে দড়ি দিয়ে উদুখলের সাথে বেঁধে রাখবেন।

কিন্তু প্রথমেতো কৃষ্ণকে ধরতে হবে। তারপরে তো বাধার প্রশ্ন। কৃষ্ণ ছুটছেন - তাই যশোদার সাধ্য কি তাঁকে ধরেন। হঠাৎ যশোদার মনে হলো - কৃষ্ণের পা তুলার চেয়েও নরম। আর সেই নরম পা নিয়ে কৃষ্ণ ভয়ে ছুটছে - না জানি কৃষ্ণের কত কষ্টই হচ্ছে - কত ব্যাথা লাগছে। হায় হায় এ আমি কি করলাম! আমারই জন্য প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণ এত কষ্ট পাচ্ছে। এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে যশোদার গতি মন্থর হয়ে গেল। আর কি আশ্চর্য! কৃষ্ণও আর ছুটতে পারলেন না। যশোদা তখন তাঁকে ধরে ফেললেন।

শ্রীমদ্ ভাগবত - এর একাধিক ভাষ্যকার এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে যতক্ষণ যশোদা কৃষ্ণকে ধরবার জন্য ছুটছিলেন, ততক্ষণ তিনি নিজের শক্তির উপরই নির্ভর করেছিলেন। তাই সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণকে ধরা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। আর কৃষ্ণও তাঁর নাগালের বাইরে ছিলেন। মাকে দেখাতে চেয়েছিলেন তাঁকে বাঁধতে চাইলেই বাঁধা যায়না। একমাত্র তিনি ধরা দিলেই কারো পক্ষে তাঁকে ধরা সম্ভব। তাই যখনই কৃষ্ণের কষ্ট হচ্ছে - এই কথা চিন্তা করে যশোদা মনে মনে কেঁদে ওঠেন তখনই কৃষ্ণ যশোদার হাতে ধরা দিলেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এখানে মনে হয় ইঙ্গিতে বলছেন - কৃষ্ণের জন্য প্রাণ না কাঁদলে তাঁকে ধরা যায় না।

(৩). যশোদা কর্তৃক কৃষ্ণের দামবন্ধন:
যশোদার হাতে ধরা পড়ে কৃষ্ণ কাঁদতে থাকেন। বা-হাতে কাজলে-লিপ্ত চোখ মুছতে মুছতে বারবার ভয় বিহ্বল চোখে মায়ের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। যশোদা তখন পুত্রের হাত ধরে লাঠি তুলে ভয় দেখিয়ে একটু ভৎসনা করলেন। এরপর চিন্তা করলেন দাস-দাসীরা বাড়ীতে নেই। এই অবস্থায় আমি যদি কৃষ্ণকে ধরে রাখি তাহলে ঘরের কাজ কে করবে? এভাবে চিন্তা করে যশোদা ঠিক করলেন যে ছেলেকে বেঁধে রেখে তিনি ঘরের কাজকর্ম করবেন। তাহলে ছেলেকেও রক্ষা করা যাবে এবং গৃহকাজও করা সম্ভব হবে। এছাড়াও দুষ্ট ছেলেকে একটু শাসন করাও দরকার।

শ্রীমদ্ ভাগবতে (১০/৯/১৩) শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলছেন: "যাঁর ভিতরও নেই, বাহিরও নেই, যাঁর আগে কেউ ছিল না, পরেও কেউ থাকবে না - অর্থাৎ যিনি জগতের অন্তরে বাইরে এবং সৃষ্টির আগে এবং ধ্বংসের পরেও বিরাজ করেন - এমনকি এই জগৎ যাঁর স্বরূপ থেকে আলাদা নয়, সেই পরব্রহ্ম স্বরূপকেই বাৎসল্য প্রেমময়ী যশোদা বাঁধবেন বলে ঠিক করলেন।

ভগবানের স্বরূপ অসংখ্য। তিনি সর্বব্যাপী ও অনন্ত। এই বিশ্বব্রহ্মান্ডও তাঁর মধ্যে অবস্থিত। সুতরাং তাঁকে কে বাঁধবে, আর কোন দড়ি দিয়েই বা তাঁকে বাঁধা যাবে? - এযে একেবারে অসম্ভব। তবুও বাৎসল্য-ভাবময়ী মা যশোদা সর্বকারণের যিনি কারণ, সর্বজগতের যিনি আধার, সর্বজগতের যিনি নিয়ন্তা - সেই ভগবানকে একটা তুচ্ছ দড়ি দিয়ে বাঁধতে গেলেন। যশোদা প্রথমে তার মাথার চুল বাঁধার পট্টডোরী দিয়ে কৃষ্ণকে বাঁধার চেষ্টা করলেন।

কৃষ্ণকে বাঁধার জন্য যে দড়ি প্রথমে যশোদা ব্যবহার করলেন তাতে দেখা গেল দড়ি দুই আঙ্গুল ছোট - কৃষ্ণকে বাঁধা যাচ্ছেনা। তাই যশোদা প্রথম দড়ির সাথে আর একটি দড়ি যোগ করলেন। দ্বিতীয় দড়ি যোগ করেও দেখলেন যে কৃষ্ণকে বাঁধা যাচ্ছেনা। আগের মতই দড়ি দুই আঙ্গুল ছোট হচ্ছে। এভাবে যশোদা যতবারই নতুন নতুন দড়ি যোগ করেন ততবারই লক্ষ্য করেন যে দুই আঙ্গুল পরিমাণ দড়ি ছোট হয়ে যাচ্ছে। এরপর যশোদা নন্দভবনে যত দড়ি ছিল সব এনে

যোগ করেও কৃষ্ণকে বাঁধতে পারলেন না। এই অদ্ভুত কান্ড দেখে প্রতিবেশী গোপীরা কৌতুক বোধ করে হাসতে লাগলেন। যশোদাও তাদের সাথে হাসতে হাসতে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হলেন।

প্রতিবেশী গোপীরা বললেন যে যশোদা, তোমার পুত্রের বন্ধনযোগ নেই। তাই ওকে তুমি এখন ছেড়ে দাও। কিন্তু যশোদার তখন জেদ চেপে গেছে - কৃষ্ণকে আজ বাঁধতে হবেই - যেমন করেই হোক।

(৪). কেন দড়ি দুই আঙ্গুল ছোট হয় এবং কিভাবে যশোদা কৃষ্ণকে বন্ধন করতে সমর্থ হন?
ভগবানতো যশোদার বিশুদ্ধ বাৎসল্য প্রেমে আবদ্ধ আছেনই। তারপরও কৃষ্ণকে বাঁধতে হলে দুটি জিনিসের প্রয়োজন-
(ক). প্রথমতঃ, ভগবানকে বাঁধার জন্য পূর্ণ ইচ্ছা এবং ব্যাগ্রতা।
(খ). দ্বিতীয়তঃ, ভগবানের কৃপা। তাঁর কৃপা হলে কোন অবস্থায়ই বাঁধা সম্ভব নয়।

অর্থাৎ ভক্তের একাগ্রতা এবং ভগবানের কৃপা একত্রে না হলে তাঁকে কোনক্রমেই বাঁধা সম্ভব নয়। যশোদার বেলায় এই দুই জিনিসেরই অভাব ছিল। তাই প্রতিবারই দুই আঙ্গুল পরিমাণ দড়ি কম পড়ছিল। যশোদা কৃষ্ণকে নিজের পুত্র জেনে তাঁকে ভয় দেখান এবং শাসন করেন। সুতরাং তাঁকে বাঁধা কিছুই কঠিন নয় - এই মনোভাব যশোদার ছিল। এর ফলে কৃষ্ণকে বাঁধবার জন্য যশোদার তীব্র ব্যাগ্রতা ছিল না। তাই বন্ধন স্বীকারের জন্য ভগবানের কৃপাশক্তিও বিকাশ হচ্ছিল না। এজন্যই বাঁধতে গিয়ে বাঁধতে না পারার অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল।

বার বার বিফল হয়ে একসময় যশোদার রোখ চেপে যায়। তিনি কৃষ্ণকে না বেঁধে ছাড়বেন না, আর কৃষ্ণও বন্ধন স্বীকার করবেন না - এভাবেই প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। একসময় যশোদা পরিশ্রান্ত হয়ে ঘেমে উঠলেন। তারপরও কৃষ্ণকে বাঁধতে হবে - এই মনোভাব রেখে কৃষ্ণের পেছন পেছন দৌড়াতে লাগলেন। একসময় দেখা যায় ভক্ত এবং ভগবানের মধ্যে যখন এই ধরণের জেদাজেদি আরম্ভ হয় তখন ভগবান নিজের জেদ ছেড়ে ভক্তের জেদই রক্ষা করেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এই অবস্থার কথাই শ্রীমদ্ ভাগবতে (১০/৯/১৮) তুলে ধরেছেন -
"স্বমাতু: স্বিন্নগাত্রয়া বিস্রস্তকবরস্রজ:।
দৃষ্টা পরিশ্রমং কৃষ্ণ: কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে।।"

অর্থাৎ মা যশোদার ঘর্মাক্ত কলেবর এবং তাঁর খোঁপার মালা খুলে গেছে দেখে কৃষ্ণ মায়ের পরিশ্রম বুঝে কৃপা করে বন্ধন স্বীকার করলেন। এভাবে যশোদার একাগ্রতা এবং কৃষ্ণের কৃপা - এই দুইয়ের সংযোগে তাঁর দামবন্ধন লীলা সমাপ্ত হলো।

(৫). এই দামবন্ধন লীলায় কি কি রসের সৃষ্টি হয়েছিল?
শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ তাঁর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে ১২টি রসের কথা উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে ৫টি মুখ্য রস :- শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর / মাধুর্য্য রস। আর ৭টি গৌণরস হল :- হাস্য, রৌদ্র, করুণ, অদ্ভুত, ভয়ানক, বীভৎস এবং বীর রস। কৃষ্ণের উপরোক্ত দামবন্ধন লীলায় পর্যায়ক্রমে নিম্নোক্ত রসসমূহের সৃষ্টি হয়েছিল বলা যায়।
(ক). প্রথমতঃ, কৃষ্ণকে নিজের হাতে তৈরী করে ননী এবং ক্ষীর খাওয়ানোর তীব্র মনোভাব যশোদার সৃষ্টি হয়। এই সময় তার মনে শুদ্ধ-সত্ব বাৎসল্য ভাবের সৃষ্টি হয়েছিল বলা যায়।
(খ). দ্বিতীয়তঃ, কৃষ্ণকে স্তন্যপান করানোর সময় যশোদার মনে তীব্র বাৎসল্য ভাব তথা বাৎসল্য রসের সৃষ্টি হয়।
(গ). তৃতীয়তঃ, দুধ রক্ষার জন্য যখন যশোদা কৃষ্ণকে স্তন্যপান থেকে বিরত রাখেন তখন কৃষ্ণের মনে রৌদ্র রসের (রাগ / ক্রোধ সৃষ্টি হওয়াকে রৌদ্র রস বলে) সৃষ্টি হয়। এই রস তীব্রভাবে সৃষ্টি হওয়ার জন্যই কৃষ্ণ পাথর নিক্ষেপ করে দধিভান্ড এবং অন্যান্য জিনিস ভেঙ্গে ফেলে।
(ঘ). চতুর্থতঃ, কৃষ্ণের উপরোক্ত কার্য লক্ষ্য করে যশোদার মনেও রৌদ্র রসের সৃষ্টি হয়।
(ঙ). পঞ্চমতঃ, কৃষ্ণকে দড়ি দিয়ে বাধার জন্য যশোদা বার বার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় এবং দুই আঙ্গুল করে দড়ি কম পড়ছিল। এখানে যশোদা এবং প্রতিবেশী গোপীরা আশ্চর্যান্বিত হয়। এক্ষেত্রে তাদের মনে অদ্ভুত রসের (কোন বিষয়ে বা ব্যাপারে আশ্চর্য বা বিস্ময়ের ভাব সৃষ্টি হলে তাকে অদ্ভুত রস বলে) সৃষ্টি হয়েছিল বলা যায়।
(চ). ষষ্ঠতঃ, যশোদা কর্তৃক কৃষ্ণকে বাঁধার প্রচেষ্টা এবং তার বিপরীতে কৃষ্ণের পলায়ন - এই দুই অবস্থা দেখে প্রতিবেশী গোপীদের মনে হাস্য রসের সৃষ্টি হয়েছিল বলা যায়।

(ছ). সপ্তমতঃ, বারবার দৌড় করায় যশোদা যখন পরিশ্রান্ত হয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর মাথার খোঁপাও খুলে পড়ে যায় তখন তাঁর মনে করুণ (কষ্টকর অবস্থার সৃষ্টি হলে করুণরস সৃষ্টি হয়েছে বোঝায়) রসের সৃষ্টি হয়েছিল।

(৬). রাধারাণী কর্তৃক কৃষ্ণের দাম বন্ধন:
ব্রজে ভগবান প্রায়শঃ শ্রীমতি রাধারাণীর সাথে পরকীয়া রসে লিপ্ত হতেন। এই করতে গিয়ে অনেক সময় রাধারাণীর সাথে তাঁর বিভিন্ন ধরণের মান অভিমান সৃষ্টি হত। এই পর্যায়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এক বা একাধিক সখা বা সখী তাদের মধ্যেকার মান-অভিমান মিটিয়ে দিতেন। রাধারাণীর প্রতি কৃষ্ণের ভালবাসা এতটাই গভীর ছিল যে প্রয়োজনে তিনি তার পাদ সম্বাহন পর্য্যন্ত করতে দ্বিধা করতেন না। এর পরোক্ষ প্রমাণ আমরা শ্রীল জয়দেব গোস্বামী রচিত গীতগোবিন্দ গ্রন্থে দেখতে পাই। পরম ভক্তিময় রসগ্রন্থ রচনার সময় খণ্ডিতা প্রকরণের দশম সর্গে “বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদি” - এই গানটি লেখার সময় “স্মরগরল খণ্ডনং মম শিরসি মস্তকম্” - এই পর্য্যন্ত লিখে “দেহি পদপল্লবমুদরম্” - এই কথা আর কিছুতেই লিখতে পারলেন না। কারণ তাঁর প্রাণারাধ্য ঠাকুরকে দিয়ে তিনি শ্রীরাধিকার চরণ যুগলে মাথা নত করাতে অত্যন্ত সংকোচ বোধ করছিলেন। এই অবস্থায় পুঁথি বন্ধ করে শুধুমাত্র ঐ কথাই মনে মনে চিন্তা করতে করতে স্নান করতে গেলেন। আর এই অবসরে রসিকশেখর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ জয়দেবের মূর্তি ধারণ করে তার গৃহে এসে জয়দেবের ভক্তিমতী স্ত্রীর কাছ থেকে উক্ত পুঁথি চেয়ে নেন এবং সেখানে স্বহস্তে জয়দেব দ্বিধার কারণে শ্লোকের যে অংশটি লিখতে পারেন নি, তা লিখে দেন। এথেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় কৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীরাধারাণীর প্রেমে এতটাই নিবেদিত ছিলেন যে প্রয়োজনে রাধারাণীর পা ধরতেও কুন্ঠিত হতেন না।

ভবিষ্য পুরাণে একটি কাহিনী আছে। একবার কৃষ্ণের সাথে অত্যন্ত অভিমান করে শ্রীমতি রাধারাণী নিজ গৃহে চলে যান এবং দ্বার বন্ধ করে অভিমান-জনিত কান্না করতে থাকেন। কৃষ্ণও কিছুক্ষণ পর নিজের ভুল বুঝতে পেয়ে চুপি চুপি অতি সংকোচিত মনে শ্রীরাধার গৃহে উপস্থিত হন। এই ঘটনা কোন এক কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে সংঘটিত হয়। অনেকক্ষণ দ্বারে মৃদু আঘাত কৃষ্ণ করলেও মানিনী রাধা দ্বার খোলেন নি। অবশেষে কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করেন যে আর কোনদিন কোন অবস্থায়ই তিনি শ্রীরাধাকে কোন ধরণের মনোকষ্ট দেবেন না। তখন রাধারাণীর মন কোমল হয়ে যায়; রাগ নিঃশেষ হয়ে যায়। তিনি দরজা খুলে দেন। ঐ অবস্থায় কৃষ্ণ দ্রুত ঘরে প্রবেশ করলে শ্রীরাধা তার কোমরের নীবি দ্বারা (নীবি হল মেয়েরা তাদের পেটিকোট যে দড়ি দ্বারা বাঁধেন) কৃষ্ণের উরুদেশ বন্ধন করে ফেলেন। সেই সময় থেকে শ্রীকৃষ্ণ নীবি-দামোদর নামেও আখ্যায়িত হন।

উপরে আলোচিত দুই ধরণের দামবন্ধন লীলার মধ্যে পার্থক্য হলো -
(ক). বাৎসল্য স্নেহে যশোদা কৃষ্ণের কটিদেশ বাঁধেন। আর শ্রীমতি রাধারাণী পরকিয়া মাধুর্য্য রসের অধিকারে একই কাজ করেন।
(খ). যশোদা কৃষ্ণকে বাঁধার জন্য প্রথমে তার মাথার ফিতা ব্যবহার করেন। রাধারাণী তাঁর নীবি ব্যবহার করেন।